Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 20 –25
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোটগল্পে জীবনচেতনার স্বরূপ ও চিরন্তন নারীর প্রকৃতি সন্ধান

শতাব্দী ধন
ইমেইল : payeldhan96@gmail.com

Keyword
জীবন, সাহিত্য, শিল্পীমেজাজ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, গ্যেটে, বাউল, বৈষ্ণব ধর্ম, শৈলী, আর্ট, সত্যান্বেষণ, চিরন্তন, নারী, ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি, মূল্য, পার্থিব, অপার্থিব, রূপ, আত্মআবিষ্কার।

Abstract
বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে ছোটগল্প লিখছেন না, লিখছেন উপন্যাস, প্রবন্ধ। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে চারটি প্রবাহের একটি হল বাউল। এই বাউল ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টিতে সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল। তাঁর প্রথম পর্যায়ে লেখা ছোটগল্পগুলিতে প্রকরণ, মেজাজ, শৈলী বর্ণনার দিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর আংশিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখনীতে চিরন্তন নারীর স্বরূপ সন্ধান সূচনা পর্ব থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। শুধুমাত্র ছোটগল্প নয়, তাঁর নারী সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধতেও পরিলক্ষিত হয়। নারী সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি অল্প বয়স থেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্য পঠন-পাঠন করতেন। এই পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবও তাঁর নারী সম্পর্কিত স্বরূপ সন্ধানের সহায়ক হয়ে উঠেছে। গ্যেটের কাছ থেকে অন্নদাশঙ্কর দুটি বিষয়ের শিক্ষা পান— ১. সত্যান্বেষণ, ২. নারীর মহিমা। অন্নদাশঙ্কর নারী ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চোউধুরী ও পূর্ববর্তী লেখকদের ভাবাদর্শেও দীক্ষিত হয়েছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলিতে আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রকৃতি, মূল্য, অবস্থান, চরিত্রের বিভিন্ন মাত্রা, স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব, চিরন্তনী স্বরূপ ইত্যাদি অনুসন্ধান করেছেন।

Discussion
জীবন ও সাহিত্য প্রতি অন্নদাশঙ্কর রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ঔপন্যাসিকের। এই শিল্পীমেজাজই তাঁকে ‘বড় আকারের উপন্যাস’ লিখতে সাহায্য করেছে। আমরা জানি, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ছোটগল্প লিখতেন না, তখন তিনি উপন্যাস নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অবশ্য তখনও তাঁর গল্প সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট। গল্প সম্পর্কে তাঁর মতামত –

> “গল্পে শুধু গল্প থাকলে চলবে না, গল্পের গুণ থাকা চাই। গল্প যেন শ্রোতাকে গুণ করতে পারে। গল্পের এই গুণ চমৎকারিতায়।”[১]

অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিকে চার অধ্যায় বলেছেন। তাঁর জীবন কোনো ছোট একটি বই নয়, মহাগ্রন্থ। তাই তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে অধ্যায়ে বিভিক্ত না করে পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন কুড়ি বছর অন্তর অন্তর তাঁর জীবনে এক-একটি নতুন পর্যায়ে এসেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনের জীবনের প্রথম পর্যায়ে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ধারা বা প্রবাহের ও শেষদিন পর্যন্ত কবিমানসে বহমান বিভিন্ন ধারা বা প্রবাহের বর্ণনা করেছেন। এই প্রবাহগুলীর মধ্যে একটি হল বাউল ধারা বা মার্গ।

তিনি বাউলদের পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, বাউলেরা প্রার্থনা করে না, উপাসনা করে না, পুজা করে না, ধ্যান করে না, মানত করে না কিন্তু তারা গান করে। গানের ভিতরেই তারা মনের মানুষের অন্বেষণ করে। তাদের কোনো জাতপাত নেই, তাই বলে তারা সন্ন্যাসীও নয়, তারা নারীসঙ্গও করে থাকে।

অন্নদাশঙ্করের উপরও বাউলের ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়েছে। কেননা, অন্নদাশঙ্করের জন্মভূমি ঢেঙ্কানালের আকাশে-বাতাসে-মাটিতে ছিল বৈষ্ণব ধ্বনি ও রস। শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যুর পর অন্নদাশঙ্করের পিতা নিমাইচরণ রায় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তখন অন্নদাশঙ্করের বয়স সাত বছর। বাড়িতে আমিষ খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বাড়িতে সারাদিন ধরেই চলত কীর্তন, পালাগান, রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা, বৈষ্ণব তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা। বালক অন্নদাশঙ্কর তাঁর মায়ের কাছে গীতগোবিন্দ ও বাবার মুখে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখের পদাবলী শুনতেন। তাঁর মনের মধ্যে দাগ কাটে কবিবল্লভের পদ। তাঁর রূপজিজ্ঞাসা প্রথম গেজেছিল বৈষ্ণব পদাবলী থেকেই। এইভাবেই বৈষ্ণব আবহে অন্নদাশঙ্করের মানসিক বিকাশ হয়েছিল।

বাউল-বৈষ্ণব সহজিয়ার প্রতি তাঁর একটি সহজ আত্মীয়তাবোধ ছিল। তাঁদের কাছে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তরও পেয়েছেন মিষ্টিক ভাষায়। অন্নদাশঙ্করের গদ্যশৈলীর মূলে যে স্নিগ্ধতা ও সরলতা, তার একটি প্রধান কারণ হল বাউলগানের সংসর্গ ও লোকসাহিত্যের উত্তরাধিকার। অন্নদাশঙ্করকে লালনের গানের 'এসোটেরিসিজম' ততটা আকর্ষণ করেনি, যতটা তার মিস্টিসিজম ও সাহিত্যগুণ আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও লালনের গান সংগ্রহ, প্রকাশ এবং তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অন্নদাশঙ্করের অনেক গল্পের মধ্যেও বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ধরনের গল্পের মধ্যে 'দু'কানকাটা' গল্পেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রভাব লক্ষ করা যায়। গল্পে সুকু সারীর মধ্যে তার রাধার সন্ধান পায়। তাই তাদের সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন কারণের জন্য শিথিলতা এলেও শেষপর্যন্ত সারী সুকুর অনুভবে রাধা হিসাবেই থেকে যায়। সমাজের চোখে যে সুকু দুই কানকাটা আসলে সেই হল যথার্থ সাধক। তাইতো সে অনায়াসেই গেয়ে যেতে পারে, 'প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।'

অনেকগুলি পরিবারের সম্মেলনে গঠিত সমাজে নারীর মূল্য ও স্থান সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা অন্নদাশঙ্করের কিশোর বয়স থেকেই উঁকি দেয়। এ বিষয়ে তিনি ইবসেন, বার্নাড শ, এলেন কেই প্রমুখ কবি, কথাশিল্পী, নাট্যশিল্পীর কাছ থেকে প্রভাবিত হন। দান্তে ও বিয়াত্রিচের অমর প্রেমকথা তিনি জন রাসকিনের লেখনীতে পড়েন বয়ঃসন্ধিতে। আর সুইডিশ লেখিকা এলেন কেই-এর 'প্রণয় ও পরিণয়' পড়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রেমের চোখে মানুষের যে মূল্যবৃদ্ধি হয় সেই মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত হয় মানবতার মধ্যে। এইসমস্ত অধ্যয়ন নবীন অন্নদাশঙ্করকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের আধুনিক মননে এক আদর্শ চিরন্তনী নারীর অন্বেষণ ছিল। নারীর প্রকৃত মূল্য কী—তার দীক্ষা তিনি গ্যেটের কাছ থেকে পান। এছাড়াও তাঁর নারী সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও পূর্ববর্তী রোমান্টিক ভাবধারা প্রভাব বীজাকারে নিহিত ছিল। কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালিখি শুরু করেন এবং শুধু বাংলাতেই নয়, ওড়িয়া ভাষাতেও তিনি নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখালিখি করেছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর এই লেখাগুলির মধ্যে নারীর চিরন্তন রূপ ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সারী, নিরুদি, চাঁপা, সুবর্ণ প্রভৃতি নারী চরিত্রদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

অন্নদাশঙ্কর রায় মূলত প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ‘সবুজপত্র’-র দ্বারা তিনি প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হন। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন,

> “রচনা কেমন করে রূপবান হবে আ ভাবনা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। গতানুগতিকতার উপর বিরাগ সবুজপত্র-ই ধরিয়ে দেয়।”[২]

‘কালিকলম’ পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে ৩০.০৯.১৯২৮-এ লেখা চিঠিতে অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন —

> “প্রমথবাবুকে...আমি গুরু মনে করি style ও বাঁচবার আনন্দের, অবশ্য রবিবাবু তো আমাদের সকলেরই গুরু।”[৩]

এছাড়াও ১৯৫২ সালের ৩১ মার্চ লেখা একটি চিঠিতে অন্নদাশঙ্কর রায় শিবনারায়ণ রায়কে বলেছেন,

> “তবে বীরবলের উত্তরসাধক কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অবশ্য নিজেকে আমি তাঁর শিষ্য বলে থাকি তা ঠিক। ... কল্লোল গ্রুপের চাইতে সবুজপত্র গ্রুপের সঙ্গেই আমার সত্যিকারের affinity।”[৪]

অন্নদাশঙ্কর নিজেকে প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য বলে মেনেছেন একথা আমরা উপরিউক্ত চিঠিগুলিতেই দেখলাম। তাঁকে গুরু হিসেবে মেনে নেওয়ার বিশেষত্ব হল —

> “কলকাতা নয়, কৃষ্ণনাগরিক ভাষাচর্চা, শব্দের ব্যাপারে শুচিবাই কমানো, ...এক বিশেষ ম্যানার অফ এক্সপ্রেশন; এপিগ্রাম, অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স, অ্যান্টিথিসিস, শব্দশ্লেষ, মার্জিত রসিকতা এবং ভার্বাল উইটের চূড়ান্ত ব্যবহার।”[৫]

অন্নদাশঙ্করের শৈলীগতভাবে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। পরে ক্রমশ প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব কাটিয়ে উঠলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তিতে বীরবলের আংশিক প্রভাব ছিল। অন্নদাশঙ্কর মননের দিক থেকে ইউরোপীয় হলেও ইমোশনের দিক থেকে তিনি পুরোপুরি বাঙালি ছিলেন। এছাড়াও তাঁর ওপর রম্যাঁ রলাঁ, রাসেল, টোমাস মান, পাস্তেরনাক প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রভাব পড়েছিল।

অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হল আর্টের প্রশ্ন। তাঁর কাছে আর্ট হল একটা অন্বেষণ। তিনি এই আর্টের মধ্য দিয়েই রিয়ালিটিকে স্পর্শ করতে চেয়েছিন। তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে পেয়েছিলেন সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। ‘পথে প্রবাসে’-র বহিঃসৌন্দর্য তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে আন্তঃসৌন্দর্যে ডুব দেয়। এই আন্তঃসৌন্দর্য প্রসঙ্গ তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ‘ও’, ‘অপ্সরা’ ইত্যাদি গল্পগুলির নাম।

এই ভাবেই অন্নদাশঙ্করের বৈষ্ণব আবহে বড় হয়ে ওঠাম পাশ্চাত্য সাহিত্যচর্চা, চিরন্তন নারী সম্পর্কে প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের প্রভাব, আর্টের অন্বেষণ প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যে ছাপ রেখে গেছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের চিরন্তনী নারীর সন্ধান ও নারী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ছটগল্প লেখবার অনেক আগে থেকেই ছিল। ইংল্যাণ্ড যাত্রার প্ররবেই তাঁর নারী সংক্রান্ত অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়ে গেছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি নারীর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বহুপূর্বেই আরম্ভ করেছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি এ বিষয়ে অনেক পাশ্চাত্য সাহিত্যও পড়েছিলেন। কটকের কলেজে পড়োবার সময় থেকেই তিনি নারীজাতির পক্ষ নিয়ে তর্ক করা ও লেখালেখির সূচনা করেন। এই কলেজে পড়াকালীনই তিনি ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘পারিবারিক নারী সমস্যা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। শচীন্দ্রলালা দাস বর্মা নামে এক অধ্যাপক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের পত্রিকায় ‘An Anti-Feminist Cry’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। অধ্যাপকের এই কবিতার উত্তরে অন্নদাশঙ্কর ‘A Feminist Counter Cry’ নামে একটি কবিতা লেখেন। এছাড়াও তিনি ওড়িয়াতে ‘নরচক্ষুরে নারী’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই সময় তাঁর মধ্যে ফেমিনিস্ট সত্তার প্রায় চূড়ান্ত জাগরণ হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ‘প্রেম ও বন্ধুতা’ নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের ‘শক্তির কথা’ প্রবন্ধটিতে নারী সম্পর্কে বলেছেন—

"আধুনিক যুগের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশে দেশে নারী জাগরণ। নারীই পুরুষের শক্তি। এটা শুধু পরিবারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নয়, সমাজের ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর সীমার মধ্যেও। ধর্মের ও নীতির ক্ষেত্রেও। নারী এতদিন পুরুষের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেছে। ক্রমেই তার সংকোচ কমে আসছে। নারীর মুক্তির পর নারীর উক্তি শুনতে আমরা উৎকর্ণ।"[৬]

এছাড়াও তিনি নারী সম্পর্কে লিখেছেন—

"নারীত্ব যদি সত্যিকারের হয় তবে আপনাতে আপনি পূর্ণ। তার জন্যে আক্ষরিক অর্থে মাতৃত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। এমন কি বিবাহেরও প্রয়োজন নেই।"[৭]

নারীর অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"চাবি চলে এসেছে নারীর আঁচলে। শুধু পরিবারের নয়, সমাজের ও সভ্যতার। নারীর মূল্য এখন যথেচ্ছ উর্বরতার নয়। সর্বক্ষেত্রে উৎকর্ষের। অধিকার এখন চাইলেই পাওয়া যাবে, যদি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে কর্তব্যের ধারণা ও অঙ্গীকার।"[৮]

অন্নদাশঙ্করের নিজের অজান্তেই গ্যেটের ভিল্‌হেল্‌স্‌ মাইস্টারের শিক্ষানবিশির মতো তাঁর শিক্ষানবিশিও ছোটবেলা থেকেই শুরু হয়। পরে অবশ্য তিনি সচেতন ভাবেই গ্যেটের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর কাছ থেকে অন্নদাশঙ্কর দুটি বিষয়ের শিক্ষা পান। যথা— ক) সত্যান্বেষণের গুরুত্ব এবং খ) নারীর মহিমা। তিনি গ্যেটের কাছ থেকেই নারীর প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবগত হন। তাই তিনি বলেন—

"দেবী নয়, নারী, তবু ঊর্ধ্বে নিয়ে চলে
ঊর্ধ্বে হতে আরো ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠ যেথায়
কবিপ্রিয়া বিয়াত্রিস সরণি দেখায়
কবি তার সঙ্গ রাখে একা নভস্তলে।"[৯]

সেই নারীর উদ্দেশ্যেই লেখকের প্রাণিপাত—

"যে নারী পূরায় বাঞ্ছা অন্তরযামিনী
তাহারে প্রণাম।
সে নয় বিভবলুব্ধা সামান্যা কামিনী
তাহারে প্রণাম।
প্রণাম হাসিয়া লয় যে ঊর্ধ্বগামিনী
তাহারে প্রণাম।"[১০]

অন্নদাশঙ্কর রায়ের নারী ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং পূর্ববর্তী রোমান্টিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী অনেকটাই ছিলেন। তবে সেই সঙ্গে নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশও চেয়েছিলেন তিনি। সর্বোপরি তিনি গল্প লেখবার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের অসামঞ্জস্য ও উদ্ভট চেহারাটা। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোটগল্পে দেখা যায়, নারী চরিত্রগুলি পুরুষের জবানীতে উঠে এসেছে। এককথায় বলা যায়, পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী। এবার আমরা তাঁর ছোটগল্পে কীভাবে বিভিন্ন মাত্রার ও অবস্থানের নারীর স্থান পেয়েছে তা নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেব।

অন্নদাশঙ্কর রায় যখন বাঁকুড়ায় জেলা জজ হিসেবে ছিলেন তখন তাঁর ছোটগল্পের এক নতুন পর্যায়-এর সূচনা হয়। তাঁর মনে হয় তাঁর ছোটগল্প নিজের পথ পেয়ে গেছে। এই পর্বে লেখা তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের মধ্যে 'দু'কানকাটা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প। এই গল্পটির সূচনা হয়েছে লেখকের ছোটবেলার অভিজ্ঞতার দিয়ে এবং কোনও

চরিত্রের সঙ্গে যৌবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এসে পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পটির সমাপ্তি হয়েছে। এই গল্পে আমরা অন্নদাশঙ্করের বৈষ্ণব ভাবনার সক্রিয় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

'দু'কানকাটা' গল্পের নায়ক সুকুমার বা সুকু হল গৌরবর্ণ, সুঠাম তনু। সে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ছেলে হয়েও বিদ্যালয় স্তরেই ঘর ছাড়ে। পড়াশুনোতে উদাসীন সুকু রামনবমীর মেলায় কীর্তনীয়া হরিদাসীর দলে 'ভিড়ে' যায়। হরিদাসী সুকুকে বলে 'তোর হবে'। সুকুর কানে অনুরণিত হয় হরিদাসীর বাক্য—'এমনভাবেই নদীতে সই ডুব দিলাম না।' সুকু বাউল দরবেশের 'আপন' মনে করে। সে মজনু ফকিরকে গুরুর আসনে বসায়। সুকুকে তার গুরু বলে, 'সুখের সন্ধান ছেড়ে বাধার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয় নিয়ো। যদি দুঃখ দেয় নিয়ো।' এরপর থেকেই সুকুর আরম্ভ হয় নায়িকা বা রাধা সাধনা। সে সারীর মধ্যে তার রাধার সন্ধান পায়। সারী সুকুকে শুক বলে ডাকে ও সুকু সারীকে রাধা বলে ডাকে। এই অসম বয়সী নায়ক=নায়িকা সব বাধা উপেক্ষা করে গান গায়, ঘুরে বেড়ায়। তারা কলকাতায় আসে। কলকাতাতে এক সাহেবের সারীর গান ভালো লাগে। সারীর গান রেকর্ড হয় কিন্তু সুকুর গান রেকর্ড হয় না। সারী পায় খ্যাতি, অর্থ। এরপর এক অভিজাত পরিবারে সারীর বিয়ে হয়ে যায়। তাও সুকু সারীকে ভুলতে পারে না। সে তল্পিদার হয়ে ঘোরে আর আনন্দলহরী বাজিয়ে গান গায়— 'প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।'

তাহলে এই গল্পে সারী নামক নারী চরিত্রটির একাধিক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক দেখা যায়। এখানে সারীকে পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক দেখা যায়— ১) সারী প্রথমে মোদকের বাড়ির বৌ ছিল, ২) অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে যায়, ৩) সুকুর সঙ্গে পরিচয় ও তার সঙ্গে চলে যাওয়া, ৪) সুকু যখন টমটমওয়ালাদের গানের আসরে থাকত ও তার ফিরতে দেরি হত, তখন সুকুর ঘরে অন্য একজন পুরুষের আগমন ঘটত, ৫) কলকাতাতে খ্যাতি, অর্থ পেয়ে এক অভিজাত পরিবারে সারীর বিয়ে হচ্ছে।

এ ভাবেই সারী নামক নারী উত্তরণ (পূর্বের অবস্থান থেকে পরবর্তী অবস্থানের) দেখানো হয়েছে।

১৯৪৪-র এপ্রিলে অন্নদাশঙ্কর বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ীতে চাকুরী সূত্রে আসেন। বাংলার বাতাসে তখনও মন্বন্তরের হাহাকার বর্তমান ছিল। সিউড়ীতে থাকা এই একবছর ছিল তাঁর সাহিত্যিক উর্বরতার কাল। এইসময় তিনি রোজ একপাতা করে 'বিনুর বই' লিখতেন ও এর পাশাপাশি বেশকিছু ছোটগল্প ও ছড়াও লিখেছেন। 'হাসন সখী' গল্পটি এই কালেরই ফসল।

'হাসন সখী' গল্পটিতে নীলুর হাসন সখী হল চাঁপা। সে ছোটবেলা থেকেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। চাঁপাকে হাসাতে নীলু ভূতুম সাজে। নীলুর বন্ধু শঙ্কর হয় বুদ্ধু। এই তিনটি চরিত্রকে মনে হয় যেন চাঁপা হল কিরণমালা। নীলু ও শঙ্কর হল অরুণ-বরুণ। নীলু তার মৃত্যুপথযাত্রিনী সখীকে মুক্তা ঝরার জল দিয়ে বাঁচিয়ে তোলে। মুক্তা এখানে আসলে আনন্দের প্রতীক। রোগমুক্ত হয়ে চাঁপার বিয়ে হয় এক প্রসিদ্ধ, দোজবর ডাক্তারের সঙ্গে। সে ডাক্তার পাঁচ সন্তানের পিতা। কিন্তু এই ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে চাঁপা সুখী হয়নি। উপরন্তু তার স্বামী তাকে অপারেশন করে চিরদিনের বন্ধ্যা করে দিয়েছিল। সে নীলুকে বলে, 'আর বেঁচে থেকে কী হবে?' এরপর ডাক্তার চাঁপাকে একা ফেলে রেখে তার সন্তানদের নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এদিকে চাঁপা ক্রমশ বিবর্ণ হতে থাকে। নীলু পুনরায় হাসন সখীকে বাঁচিয়ে তোলে। আসলে চাঁপা 'শুকিয়ে যাচ্ছিল সখ্যের অভাবে নয়, প্রেমের অভাবে।'

'বিনুর বই'-র শুরুতেই অন্নদাশঙ্কর বলেছেন—

> "জল না পেলে গাছ শুকিয়ে যায়, রস না পেলে মানুষ..."[১১]

এই প্রসঙ্গটিই গল্পে ফিরে হিরে এসেছে।

তিনি ছোটগল্পের পরিসরে নারীর অবস্থান ও অধিকারকে বিচার করেছেন। নারীর মূল্য সংক্রান্ত চিন্তার সূত্রে নয়, তাঁর নিজস্ব চিন্তার মধ্যে রয়েছে চিরন্তন নারীর সন্ধান। তিনি চিরন্তন নারীর উল্লেখ তথা ধারনা পেয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারি কথা' ও পরে ইউরোপে গিয়ে প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে প্রত্যক্ষ করেন চিরন্তন নারীমূর্তি ভেনাস ডে মাইলো।

এখানেও চাঁপার মধ্যে নারীর চিরন্তনী প্রকৃতির ছাপ পাওয়া যায় ও যক্ষ্মারোগে হয়েও সে নিজের জীবনকে নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাই গল্পের শেষে দেখি, মধুপুরে আলাপ হওয়া এক যক্ষ্মারোগীর তিন-চারটি ছেলেমেয়েকে সে নিজের সন্তানের মতো করে মানুষ করেছে। এই মাতৃত্বের স্বাদের মধ্য দিয়েই চাঁপা পুনরায় নতুন করে বাঁচতে চায়। এইভাবেই নেতির থেকে ইতির পথে উত্তরণের মধ্য দিয়ে ও চাঁপার মধ্য দিয়ে চিরন্তন নারীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আবার 'উপযাজিকা' গল্পের সুবর্ণের সঙ্গে চাঁপার কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। দুইজনেই তারা চিরন্তনী নারী প্রকৃতির। সৃষ্টি ছাড়া তাদের জীবন যেন অর্থহীন, ব্যর্থ। শরীরে আছে তৃষ্ণা; সেটা মিথ্যা নয় কিন্তু তাদের অন্তরে প্রবাহিত চিত্তপিপাসাও সমানভাবে সত্য। সুবর্ণ দুটোই পেয়েছে। এর জন্য চরম মূল্য দিতেও সে অকুণ্ঠিত, কিন্তু চাঁপা এখানে ব্যর্থ। এভাবেই গরলকে স্বীকার করে নিয়েই অমিয় স্বাদুতাকে গাঢ়তর অনুভবনীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চাঁপা ও সুবর্ণ।

অন্নদাশঙ্করের কলকাতাবাস পর্বে লেখা গল্প হল 'অপ্সরা'। এখানে দেখব, নিরুদির সাধনা বা বেঁচে থাকবার মূল রসদ যে গান তা তাঁর স্বামী জীবনবাবু পছন্দ করতেন না। এমনকি চার ছেলে-মেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাড়ির বাওরে থাকবার ইচ্ছেটাই শেষ হয়ে আসে ও মৃত্যু নেমে আসে। মৃত্যুর পরে জীবনবাবু তাঁর স্ত্রীকে নতুন করে ও নতুন রূপে উপলব্ধি করেছেন।

এই গল্পের নিরুদির মধ্যেও আমরা চিরন্তনী নারী প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও নিরুদি যেন কোথাও একটু আলাদা। হয়তো স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর গানের চর্চার অবকাশ ছিল না তবুও সেই নিরুদিই কাজের ফাঁকে গুনগুন করে গান গায়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নিরুদি কথককে বলেন তিনি অপ্সরা। এই নিরুদির মধ্যে পার্থিব থেকে অপার্থিব জগতে প্রবেশের আভাস পাওয়া যায়। এ যেন সীমা থেকে অসীমে ও রূপ থেকে অরূপলোকের পথে যাত্রা। নিরুদি যেন পার্থিব জগতের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করেছেন।

এইভাবেই অন্নদাশঙ্কর রায় নারীর মধ্যে নারীর নিজস্বতা, রহস্যমুক্ত অথচ গভীর, পূর্ণ আত্ম-আবিষ্কার, বিচিত্র রহস্যময় রূপের মধ্য দিয়ে চিরন্তনি, আবার কোথাও চিরন্তনীর থেকে একটু ব্যতিক্রমী নারীকে বিভিন্ন মাত্রায় কলমের রেখায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, অন্নদাশঙ্কর, 'গল্পসমগ্র', বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ৪
২. রায়, শিবনারায়ণ, সম্পাদক, 'বিবেকী শিল্পী অন্নদাশঙ্কর', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ. ৫৬
৩. তদেব, পৃ. ৫৮
৪. তদেব, পৃ. ৫৯
৫. তদেব, পৃ. ৫৯
৬. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, 'অন্নদাশঙ্কর রায়', সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ১০৪
৭. তদেব, পৃ. ১০৫
৮. তদেব, পৃ. ১০৫
৯. দাশগুপ্ত, ধীমান, 'চিরহরিৎ বৃক্ষ : অন্নদাশঙ্কর', বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০২, পৃ. ১২৩
১০. তদেব, পৃ. ১২৩
১১. তদেব, পৃ. ১২৫